খণ্ড ১৫, সংখ্যা ১৭ ভাবনগর জুন ২০২২
Vol. 15, No. 17 BHĀBANAGARA June 2022

বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের বিকাশের সংক্ষিপ্ত-সার

লু মেংকি

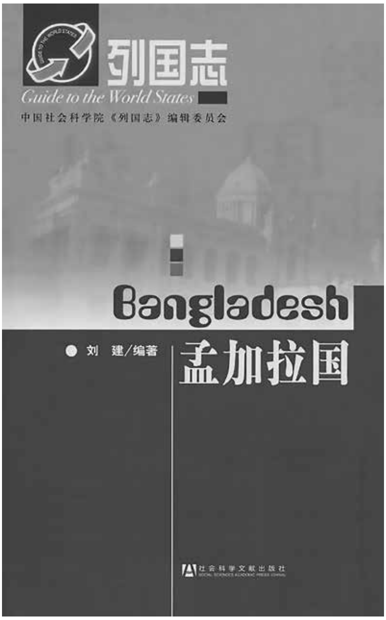

চীনাভাষার বাংলাদেশ বিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

An Overview of the Developmental Overview of Bengali Marine Literature

Lu Mengqi

Abstract

As a branch of South Asian marine literature, many writers have appeared in Bengali marine literature, they have created many outstanding works. This article gives an overview of the developmental overview of Bengali marine literature, features of the creator and creative features. The period of development of Bengali marine literature can be divided into three stages, , marine literature of British India era, marine literature before and after independence of Bangladesh and marine literature of contemporary Bangladesh. The characteristic of the creator of Bengali marine literature is that the giants of literature have far-reaching effects, the leading men open a new era and the rising stars strive for improvement. From the point of view of creation, the genre of Bengali maritime literature is basically poetry, with different features at different times, gradually showing the way that transform from Hindu culture to Islamic culture.

বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যে মহাসাগর বিভিন্ন প্রতীকী অর্থ উপস্থাপন করে। মানবজাতির দ্বারা সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি এবং বিকাশের সাথে সাথে সমুদ্র সাহিত্যের মূলও পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে সমুদ্রের দেবতা পোসেইডন ছিলেন শক্তিশালী এবং আক্রমণাত্মক একজন দেবতা এবং ইজিয়ান সাগরের কাছে গ্রীক নাবিক ও জেলেদের দ্বারা উপাসনা করা হতো। (লু গ্যাং। ১৯৮৯ : ৭২৪)। হেমিংওয়ের উপন্যাস *দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি*-এ সমুদ্র কখনও কখনও প্রশান্তির অবস্থা উপস্থাপন করে, তবে এতে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। নায়ক শুধু সমুদ্রের উপর নির্ভর করে না, সমুদ্র জয় করার ইচ্ছাও আছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের প্রকৃতির কারণে ভারত মহাসাগর বিশ্বের সমস্ত মহাসাগরের মধ্যে প্রাচীনতম শিপিং কেন্দ্র হয়ে উঠেছে; দক্ষিণ এশীয় সাহিত্যেও সাগরের উপস্থিতি দেখা যায়। যা-ই হোক, সিন্ধু ও গঙ্গা অববাহিকায় অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যের বর্ণনায় নদীগুলির তুলনায় মহাসাগরগুলি অনেক কম দেখা যায়। দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করেন, তার সৌন্দর্য অপূর্ব; কিন্তু সমুদ্র সমৃদ্ধ রূপক ছাড়া একটি কল্পনার দৃশ্য মাত্র। ভারতীয় মহাকাব্য *রামায়ণ*-এ, হনুমান সীতাকে খুঁজতে দ্বীপে গিয়েছিল। রাম এবং রাবণ সমুদ্রে যুদ্ধ করেছিল, সমুদ্র শুধু একটি পটভূমি, প্রতীকী অর্থ এর মনস্তাত্ত্বিক কোনও প্রকাশ নেই।

বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্য দক্ষিণ এশীয় সামুদ্রিক সাহিত্যের অন্তর্গত। তুলনামূলকভাবে দেরীতে হয়েছিল, তবে এর অনন্য সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১. বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ ব্রিটিশ ভারত আমল

উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের আধুনিক সংস্কৃতি এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, যা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানকে জাগিয়ে তুলেছিল। (Liu Jian, 2010: 181)। ব্রিটিশ ভারতে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা ব্যবহারিক সমস্যার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেন।

১৮৬০-এর দশকে বাংলা সাহিত্য ছিল আধুনিক ও সমৃদ্ধ; এ সময়ে নাটক ও কবিতার বিকাশ হয় এবং আধুনিক গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬১ সালে বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে *রামায়ণে*র উপাখ্যান অবলম্বনে মহাকাব্য *মেঘনাদবধ কাব্য* তৈরি করেছিলেন। (আজাদ, ২০০৭)। এই কাব্যে সমুদ্রের প্রতি

মেঘনাদবধ কাব্যের *কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত*

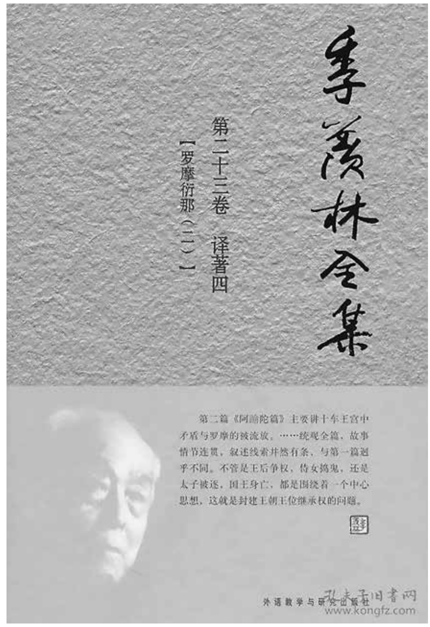

চীনা-ভাষায় অনুবাদ রামায়ণের *প্রচ্ছদচিত্র*

রাবণের চরম ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। রণক্ষেত্রে পুত্রের শব দেখে রাবণ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তার দৃষ্টি পড়ে নিকটবর্তী সমুদ্রের প্রতি। রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়ে স্বমহিমায় আবির্ভূত হওয়ার আহবান জানান ।

১৮৬৬ সালে বাঙালি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় তীর্থ ভ্রমণ শেষ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় কুয়াশায় নৌকা দিকভ্রান্ত হয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়। কপালকুন্ডলার সাথে তার দেখা হয়। যিনি তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতেন। কপালকে নবকুমার শহরে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। কপাল তার স্বামী এবং পরিবারকে বাঁচাতে তার জীবন শেষ করতে চেয়েছিলেন। কপাল-এর গল্প ধর্মীয় উগ্রবাদের দ্বারা নারীর নিপীড়নকে প্রকাশ করে। (অসিত কুমার, ২০০৭ : ৫১০)। উপন্যাসে সমুদ্রের বিস্তৃতি এবং কপালের অসহায়ত্বের বিপরীতে সামন্ত শক্তির ইঙ্গিত দেয় যা ভারতীয় নারীদের সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো নিপীড়ন করে।

১৮৭০-এর দশক থেকে ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত বিখ্যাত লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরের বিশাল সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রায়ই সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। *সোনার তরী* কাব্যের “সমুদ্রের প্রতি” কবিতায় তিনি সমুদ্রের সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। ঝড়ে পুরীর তীর্থযাত্রীদের জাহাজ ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি রচনা করেন “সিন্ধুতরঙ্গ” কবিতাটি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

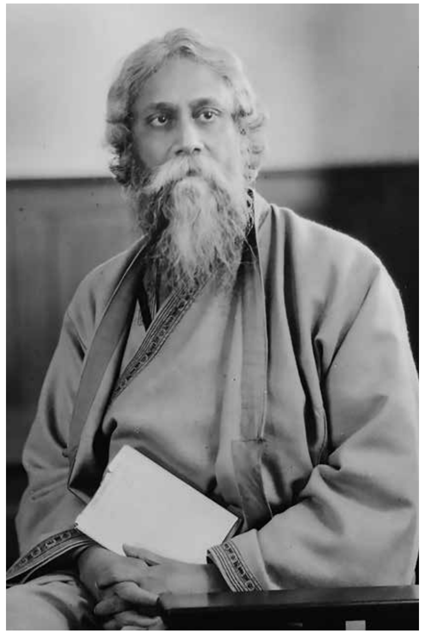

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সংকলন *কড়ি ও কোমল*-এ প্রচুর পরিমান সাহিত্যকর্ম সমুদ্র-সম্পর্কিত কবিতার আবির্ভাব ঘটেছে; যেমন—"সিন্ধুগর্ভ", "সমুদ্র", "সিন্ধুতীরে" ইত্যাদি। "সিন্ধুগর্ভ" কবিতায় কবি আকাশ ও সাগরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন এবং জীবন দর্শনে সমৃদ্ধ সমুদ্রের নীচে অতল গহ্বরের নিঃসঙ্গতা নিয়েও চিন্তা করেছেন। "সমুদ্র" কবিতায় কবি সমুদ্রকে একটি ক্রন্দনরত শিশুর সাথে তুলনা করেছেন, সমুদ্রের সংযত এবং বাধাগ্রস্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বে ভরিয়ে দেওয়াটা তার দীর্ঘকালের লালিত ইচ্ছা বলে প্রকাশ করেছেন। "সিন্ধুতীরে" কবিতায় কবি অপবাদ ছাড়াই শাশ্বত আলোয় পূর্ণ সমুদ্রের রাজ্যকে চিত্রিত করেছেন, যা কবির আত্মদর্শনের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে মূর্ত করে তোলে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের আরও বিকাশ ঘটে। এদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৯১৭ সালে লেখা চার খণ্ডের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *শ্রীকান্ত* সবচেয়ে বিখ্যাত। এতে ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের শুরুতে ভারতের সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এটি ভারতীয় বাস্তববাদী সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত হয়। (জর্জ, ১৯৯৩)। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের ২য় পর্বে শরৎচন্দ্রের জাহাজে চড়ে বার্মা ভ্রমণের বর্ণনা পাওয়া যায়। গভীর সমুদ্রে তাঁর জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে। দুর্জয় ঝড়ের শক্তি ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ তিনি অনুভব করেছিলেন সমগ্র চেতনা দিয়ে। তিনি সমুদ্রের ভয়ঙ্কর শক্তি অনুভব করেছিলেন।

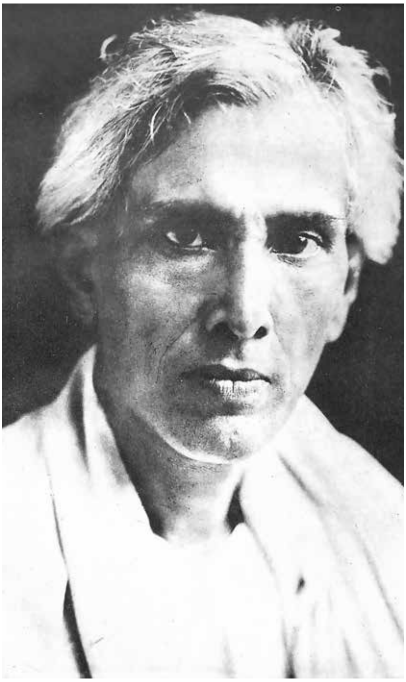

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম

১৯২৭ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর “সিন্ধু-হিন্দোল” কবিতায় সাগরের উন্মাদনার বর্ণনা দিয়েছেন। “সিন্ধু-হিন্দোল” কবিতার তরঙ্গে নজরুল চিত্ত একীভূত হয়ে যায়। তাই বিক্ষুব্ধ জলরাশি সংকুল সিন্ধু হয়ে যায় কবির বন্ধু। সাগরের ঢেউয়ের উল্লেখ করে বর্তমান সমাজের প্রতি তার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হৃদয়ে সীমাহীন বেদনা। (ল্যাংলি, ২০০৭)। তিনি সমুদ্রকে বিদ্রোহী এবং ভূমি দখলকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ক্ষোভের জোয়ারে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, সাগর হয়ে ওঠে কবির বন্ধু। কবিতার তৃতীয় অংশে কবি ও সাগরের বন্ধুত্ব আর থাকে না, সমুদ্র এক চরম নির্জন দৃশ্যে পরিণত হয়।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সৈয়দ ফররুখ আহমদ *সাত সাগরের মাঝি* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যগ্রন্থে পুনর্জাগরণের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এটা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর সৃষ্টিকারী একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হয়ে ওঠে। কবিতায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংস্কৃতি ও জাগ্রত চেতনা। একই সাথে রয়েছে সমুদ্রের বর্ণনা, যা সমুদ্র অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করে। সাগর হয়ে ওঠে কবিতার সঙ্গী, আর সাগর হয়ে ওঠে এক রোমান্টিক প্রতিচ্ছবি, কবির অনুরণন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফররুখ আহমদ

১.২ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী কালের রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত ছিল, এবং সাহিত্য প্রথম সারিতে পরিণত হয়েছিল, চিন্তা ও মতামতের ভিন্নতার জন্য। সামুদ্রিক সাহিত্য সৃষ্টি একটি রোমান্টিক পরিবেশ বজায় রেখেছিল। ১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *সমুদ্রের স্বাদ* উপন্যাসটি লেখেন। গল্পে নায়িকা নীলা তার বাবার কাছে শুনেছেন যে, চারপাশ বেষ্টন করে আছে সমুদ্র এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর। নীলার মধ্যে জেগে উঠেছিলো সমুদ্রের প্রতি ভালোবাসা। সমুদ্র দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত। বাবা তাকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবে এমন কথা দিলেও হঠাৎ তার মৃত্যুতে নীলার আর সমুদ্র দেখা হয়ে ওঠেনি। নীলা তার রক্ত এবং চোখের জলে সমুদ্রের লবণাক্ততা অনুভব করতে পেরেছিলো। সাগর আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু স্পর্শ করা কঠিন, আদর্শ জীবনের মতো নাগালের বাইরে থাকে। (নির্মল, ২০০৮)।

১৯৭৩ সালে আল মাহমুদ "সমুদ্র নিষাদ" কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতায় সমুদ্রের একটি বহুমাত্রিক রূপ রয়েছে এবং আদিম উপজাতি হিসেবে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা সমুদ্রের উপর নির্ভর করে। কবি সমুদ্রের প্রতি তার প্রশংসা এবং নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন, সমুদ্র এবং জেলেদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন প্রকাশ করেছেন। (হাকিম, ২০১২)। কখনো কখনো সমুদ্র মায়ের মতো বসবাসকারীদের লালন-পালন করে, সমুদ্র দয়ালু ও উদার।

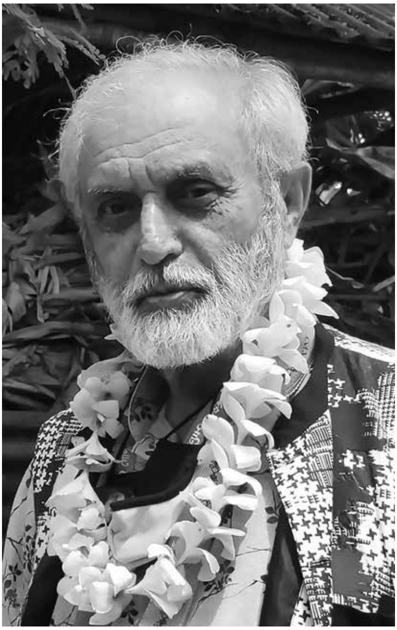

আল মাহমুদ

মুহম্মদ নূরুল হুদা

১.৩ সমসাময়িক বাংলা মহাসাগর সাহিত্য

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্য বিকাশের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, সামুদ্রিক সাহিত্যও আরও বিকশিত হয়েছে।

মুহম্মদ নূরুল হুদাকে বাঙ্গালীরা সাগরের সন্তান বলে। তাঁর মনে সাগর এক চিরন্তন সত্তা। কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষায় সমুদ্রকে বলা হয় "দইজ্জা", যার প্রমিত শব্দ "দরিয়া"। মুহম্মদ নূরুল হুদা এই "দরিয়া" শব্দেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এই দরিয়া হলো কক্সবাজারের উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ জলরাশির বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রজাত এই ভূখণ্ডকে তিনি দরিয়ানগর হিসেবেই দেখেন। তিনি "দরিয়ানগর" কবিতায় সমুদ্রের প্রতি তার মুগ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বঙ্গোপসাগর নামের সমুদ্রের প্রশংসা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, তাঁর বাড়ি সমুদ্র দ্বারা বর্ধিত নদীপথে। সমুদ্র এবং দরিয়ানগরের মানুষেরও ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর অভিলাষ এই দরিয়ানগরে যেন হাজার বছর বেঁচে থাকেন। এবং সমুদ্র তাঁর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সাথে একীভূত হয়।

২. বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের লেখকের বৈশিষ্ট্য

২.১ ক্ষমতাবানদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে

বাঙ্গালা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি, লেখক, সমাজকর্মী, দার্শনিক এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে, রবি ঠাকুর তাঁর

সারাজীবনে প্রচুর সংখ্যক কবিতা এবং উপন্যাস লিখেছেন। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন; তাঁর পূর্বে এত বড় সম্মান আর কোনও এশিয়ান অর্জন করতে পারেননি। তিনি শুধু বাংলাদেশী বা ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব রাখেন না, চীনা সাহিত্যেও তাঁর গভীর প্রভাব রয়েছে ।

রবি ঠাকুরের অনেক রচনায় ১৯ শতকের শেষের দিককার বাঙ্গালী সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে স্পর্শ করে; যেমন, ঐতিহ্যগত খারাপ অভ্যাসের সঞ্চয় এবং বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নারীর জন্য গভীর দুর্ভোগ। (লি জিনুন, ২০০৯ : ৬)। তিনি সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রগতিশীল প্রবণতা দেখিয়ে অনেক স্বতন্ত্র চরিত্র চিত্রিত করেছেন। রবি ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মে ভালোবাসার সুসমাচার প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে, মানবজাতি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতার একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে। শৈল্পিক দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর কাজগুলি একটি শক্তিশালী গীতিমূলক বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে, বিশেষ করে মাস্টারপিস *গীতাঞ্জলি*, যা কাব্যিক ভাষায় দেবতাদের একটি স্তোত্র লিখেছিল। ঠাকুরের কাব্যিক শৈলী আধুনিক চীনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং চীনের গুও মোরুও, জু ঝিমো, জি ওয়ানিং-এর মতো লেখকদের একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাঁর অনেক রচনা বহুবার চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে সামুদ্রিক সাহিত্যের অনুপাত বেশি না হলেও বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যে তাঁর রচনা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে ।

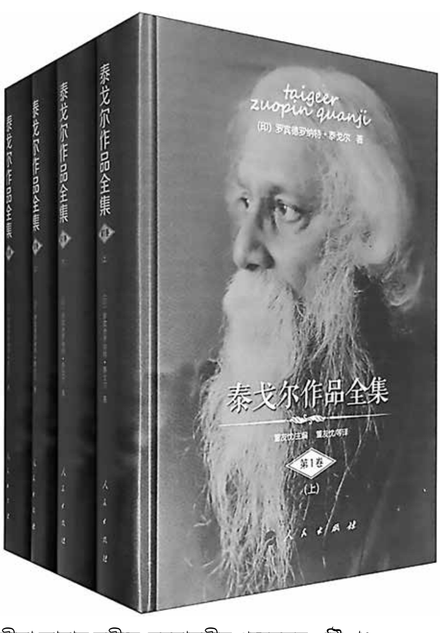

চীনা ভাষায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রচ্ছদসহ ৪টি খণ্ড

চীনের এনসাইক্লোপিডিয়া বিদেশীসাহিত্য-এর প্রচ্ছদ

২.২ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করেন

বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা নতুন সাহিত্য ফ্রন্ট খুলেছেন। যদিও সামুদ্রিক বিষয়ভিত্তিক সাহিত্যকর্ম তাঁদের কাজের সামান্য অনুপাতের জন্য দায়ী, তারা তাদের সাহিত্যের মর্যাদার কারণে উজ্জ্বল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন ১৯ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, নাট্যকার এবং কৌতুকনাট্য রচয়িতাদের একজন। ঐতিহ্যের অনুবর্তিতা অমান্য করে নব্যরীতি প্রবর্তনের কারণে তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্ম হলেও তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য অনেক অমর নাটক, কৌতুক ও কবিতা তৈরি করেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। (দুলাল, ২০০৭)। বাংলার সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদীদের একজন হিসাবে, তিনি ভারতে হিন্দু বিধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক উপন্যাস লিখেছেন। (ঝো ঝিকুয়ান, ১৯৯২ : ১৯০)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও আরেক একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক এবং তিনি ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পেশাদার লেখক। তিনি ভারতীয় সমাজের অসমতা এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিষয়বস্তু নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন এবং গ্রামীণ জীবনকে পটভূমি করে অনেকগুলি রচনা তৈরি করেছিলেন, অনেক পাতি বুর্জোয়া চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন, বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছেন এবং ঔপনিবেশিকতাকে গভীরভাবে উন্মোচিত করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁকে একজন বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রেম, মুক্তি ও বিদ্রোহ প্রাধান্য পায়। (মিত্র, ১৯৯৩)। তাঁর কবিতা ও গানে সর্বদাই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লেখকের স্পষ্ট বিরোধিতা দেখা যায়। তিনি বাংলা কবিতার একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন।

সৈয়দ ফররুখ আহমদকে “মুসলিম রেনেসাঁর কবি” বলা হয়। তাঁর কবিতা বাংলাদেশে পতিত মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছে। (ফারুক ফাউন্ডেশন, ২০১২)। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট কাব্যভাষা বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম রেনেসাঁর বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২.৩ উদীয়মান তারকারা উন্নতির চেষ্টা করেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশী সাহিত্য আরও বিকশিত হয়েছে, বাস্তববাদ এবং আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে , তবে তুলনামূলকভাবে কম লেখকেরই আন্তর্জাতিক সমাজে এবং বিশ্বে ভাল খ্যাতি রয়েছে। দেশে-বিদেশে বাংলা সামুদ্রিক সাহিত্য এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রতিও মনোযোগ কমে গেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি হলেন আল মাহমুদ। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন উপায় ও শৈলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। (মুহাম্মদ মুসা, ১৯৯৮)। তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন।

মুহম্মদ নূরুল হুদা একজন বিখ্যাত আধুনিক ও সমসাময়িক বাংলাদেশী কবি। তিনি "জাতিসত্তার কবি" হিসেবেও পরিচিত। (খান সানজিদা, ২০১২)। তিনি একজন ঔপন্যাসিক এবং সাহিত্য-সমালোচকও। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন ।

৩. বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

৩.১ সৃজনশীল ধারা প্রধানত কবিতা, এবং সাহিত্য গোষ্ঠী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

কবিতা এমন একটি সাহিত্যিক ধারা যা লেখকের সমৃদ্ধ আবেগগুলিকে অত্যন্ত ঘনীভূত ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করে যার একটি নির্দিষ্ট ছন্দ এবং উচ্চ মাত্রার গীতিকবিতা রয়েছে। তাদের মধ্যে, মহাকাব্য হলো লোককাহিনী বা বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা সম্বলিত একটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা, যা গীতিকবিতা এবং এটি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ। বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যে কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, তবে উপন্যাস এবং গদ্যও রয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্য-এর ধারাটি মহাকাব্য। অমিতাভ সূত্র থেকে *রামায়ণে*র উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে কবি যুদ্ধের দৃশ্য এবং নায়কের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে চিত্রিত করতে কবিতায় প্রচুর কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

"সমুদ্রের প্রতি", "সিন্ধুতরঙ্গ", "সিন্ধুগর্ভ", "সমুদ্র", "সিন্ধুতীরে" সবকটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা, যা সমুদ্রের বর্ণনা করার সময় বিভিন্ন আকারে উপস্থাপিত হয়, দার্শনিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসহ।

"সিন্ধু-হিন্দোল" কবিতায় লেখক কাজী নজরুল ইসলাম সমুদ্রের সঙ্গে আলাপ করেছেন এবং সমুদ্র বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন।

ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি" কবিতায় সাগর রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ এবং তা ঐতিহ্য ও জাগ্রত চেতনা বহন করে।

মুহম্মদ নূরুল হুদার "দরিয়ানগর" কবিতার সাগরটি লেখকের চিরন্তন দেহ এবং আত্মার ভরণপোষণ, এবং এটি নিজের শহর যা ছেড়ে দেওয়া কঠিন।

আল মাহমুদের "সমুদ্র নিষাদ" কবিতায় সমুদ্রের বহুমাত্রিক আত্মা রয়েছে, যা সমুদ্রতীরের জেলেদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

সমুদ্র সম্পর্কিত বাংলা উপন্যাসগুলি চরিত্র চিত্রিত করার উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং সম্পূর্ণ গল্পের প্লট এবং পরিবেশগত বর্ণনার মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সাহিত্যের ধারাকে প্রতিফলিত করে। সাধারণত এর তিনটি উপাদান থাকে: চরিত্র, প্লট এবং পরিবেশ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, উপন্যাসগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল ধারা হয়ে উঠেছে এবং সেগুলি বেশিরভাগই সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে বা রোমান্টিক অনুভূতিগুলিকে বর্ণনা করে। সমুদ্রের চিত্রটি বেশিরভাগ পরিবেশের বর্ণনায় উপস্থিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে সমুদ্র হলো নায়ক-নায়িকা মিলিত হওয়ার জায়গা। চার খণ্ডের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *শ্রীকান্ত*-তে সমুদ্র হলো লেখকের যাত্রার একটি দৃশ্য। *সমুদ্রের স্বাদ* উপন্যাসে সমুদ্র হলো নায়কের আধ্যাত্মিক বাড়ি।

আমার মনে হয়, বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্যের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য গোষ্ঠীগুলি “প্রাকৃতিক বৃদ্ধি এবং সর্বত্র প্রস্ফুটিত” এর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। বেশিরভাগ লেখকই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগামী; নির্দিষ্ট সামুদ্রিক সাহিত্য সম্ভার নেই।

৩.২ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, নতুন এবং পুরানো কাজ একে অপরের পরিপূরক

সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, পর্যায়ক্রমে এর প্রকৃতি বিশেষভাবে স্পষ্ট নয়, তবে একথাও ঠিক, এটি বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে এবং তা উপস্থাপন করে আসছে।

ব্রিটিশ ভারতীয় যুগে বাঙ্গালা সামুদ্রিক সাহিত্য বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং সাহিত্যের ক্লাসিকের প্রভাব এখনও সুদূরপ্রসারী। তবে, সামুদ্রিক সাহিত্যে এমন প্রগতিশীল ধারণাও রয়েছে যা ব্যবহারিক বিষয়গুলিতে বেশি মনোযোগ দেয় এবং জাতিগত কুসংস্কারের বিরোধিতা করে।

সংস্কৃত মহাকাব্য *রামায়ণ*, যা ১৫ শতকে কৃত্তিবাস ওঝা দ্বারা বাংলায় অনুবাদ ও পুনঃলিখিত হয়েছিল, এটি বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে পরিচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মূলত পূর্বোক্ত *রামায়ণের* উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে এবং তাঁর মহাকাব্য *মেঘনাদবধ কাব্য* তৈরি করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রাচীন শব্দগুলির শব্দভাণ্ডার এবং ছন্দ স্পষ্টতই ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯ শতকের শুরুতে কলকাতা ধর্মীয় সংস্কার এবং সাহিত্য বিপ্লবসহ নবজাগরণের সূচনা করেছিল, যা বাঙ্গালী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাঙ্গালীর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন এবং জাতিগত কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। এই সময়ে, এই ধরণের ধারণা দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *কপালকুণ্ডলায়*। এই উপন্যাসে চরম ধর্মবাদের দ্বারা নারী নির্যাতন ফুটে ওঠে; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *শ্রীকান্ত* এটি ভারতীয় সমাজ জীবনের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার একটি অভিযোগ; কাজী নজরুল ইসলামের “সিন্ধু-হিন্দোল” কবিতাটি একটি প্রেম, মুক্তি এবং বিদ্রোহ-এর রূপক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী কালে, বাংলাদেশের জনগণ অন্ধকারতম মুহূর্তগুলি অনুভব করেছে, তাদের মাতৃভাষার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে এবং গণতন্ত্রের অধিকার উপভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে, বাংলাদেশ দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। যদিও এটি একটি দুর্বল ভিত্তি থেকে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করার দ্বিধাগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়, তবে এর উন্নয়নের সম্ভাবনা বিশাল। আশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাহিত্য সৃষ্টিকেও প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী কালে সামুদ্রিক সাহিত্যে আবার সমুদ্রকে কেন্দ্র করে সামুদ্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি এবং সমুদ্রের দিকে বহুমাত্রিক আবেগ বিকিরণ করে, রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সমুদ্রের স্বাদ* উপন্যাসটি আদর্শ এবং জীবনের প্রতিফলন, সামান্য অসহায়ত্ব এবং একাকীত্বের প্রতিফলন; আল মাহমুদের "নিষাদ" কবিতাটি সমুদ্রের প্রতি একটি বার্তা, প্রশংসা এবং নির্ভরতা প্রকাশ করে; মুহম্মদ নূরুল হুদার "দরিয়ানগর" কবিতাটি সমুদ্র সম্পর্কে একটি প্রেমের কবিতা, যাতে সমুদ্রের প্রতি আবেশ ও আকুলতা রয়েছে।

৩.৩ হিন্দু সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ইসলামী সংস্কৃতির পথ ধরল

ইতিহাসে বাংলা অঞ্চল একসময় দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে ধনী অঞ্চল ছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার সূচনায়, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী আরব বণিকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে। অনেক কারণে বাংলা অঞ্চল শেষ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের সামুদ্রিক সাহিত্যের বিকাশের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যেমন, ইসলামী সংস্কৃতি ক্রমশ মূলধারা দখল করছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলার কায়স্থ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলায় ভারতীয় সামন্ত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর অনেক প্লট বা আখ্যান ঐতিহ্যগত ক্লাসিক দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদীদের প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন যারা ভারতে হিন্দু বিধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। তার বেশ কিছু উপন্যাস রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত হিন্দুদের উপর মনোনিবেশ করে। তাঁর *কপালকুণ্ডলা* চরম ধর্মীয়তা দ্বারা নারীর নিপীড়নকে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মধর্ম তথা ব্রহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, কিন্তু পশ্চিমা মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁর প্রচুর সহনশীলতা রয়েছে। তিনি সর্বেশ্বরবাদের পক্ষে ছিলেন এবং ধর্মীয় গীতিকবিতার বিখ্যাত সংকলন *গীতাঞ্জলি* রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বান্তকরণের ভিত্তি হলো মানব প্রকৃতি এবং জীবনের চেতনার জাগরণ, সামন্তবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রগতিশীল প্রবণতা দেখা যায় এবং অনেক কাজ নারী মুক্তির মতো সামাজিক সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামুদ্রিক সাহিত্যকর্মে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রবণতাও প্রতিফলিত হয় এবং অধিকাংশ লেখকই সমুদ্রের মাধ্যমে তাদের ভেতরের আবেগ প্রকাশ করেন।

প্রাবন্ধিক-গবেষক লু মেংকি শান্তি

কাজী নজরুল ইসলাম এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মীয়। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশংসা করার সাথে সাথে ভারতের অবহেলিত মানুষের জন্য ভালবাসা প্রকাশ করেছেন । তাঁর রচনাগুলি মহান প্রেমের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখায় এবং "সিন্ধু-হিন্দোল" রচনায় সমুদ্র হিন্দু বা মুসলমানের মিত্র কিনা তার উপর জোর দেয় না; তবে, সমগ্র বাংলার সমাজকে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মনের কথা বলেছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতি বাংলাদেশী সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন বাংলাদেশের সামুদ্রিক সাহিত্যে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর সৃষ্টিকারী প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাগুলির মধ্যে সৈয়দ ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি* অন্যতম। এই কবিতার সংকলনে রয়েছে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও জাগ্রত চেতনা এবং একই সঙ্গে রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। মুহম্মদ নূরুল হুদার "দরিয়ানগর" ইসলামী সম্প্রদায় এবং সমুদ্রের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ প্রতিফলিত করে, যেমন লেখকের আধ্যাত্মিক বাড়ি। কবিতায় সমুদ্র ছিল শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ।

উপসংহার

বাংলাদেশী সামুদ্রিক সাহিত্যের বিকাশ বাংলাদেশী অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে, এবং সামুদ্রিক চিত্রের বিবর্তনও অনুমান করেছে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সৃষ্টি রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য দেখায়, এবং বাস্তববাদের দিকে বিকাশের প্রবণতাও প্রতিফলিত করে এবং ধর্মীয় সভ্যতার পথ দেওয়ার প্রবণতার সাথেও পরিবেষ্টিত হয়। বাংলাদেশী সামুদ্রিক সাহিত্য অনন্য বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে; যদিও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম আছে, সৃষ্টিকর্তা বেশিরভাগই বাংলাদেশী বিশ্বে সাহিত্যের মাস্টার এবং অগ্রগামী; লেখকের দলটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী; তবে, কোনও নির্দিষ্ট সামুদ্রিক সাহিত্য সাহিত্য নেই। একজন বাংলা ভাষার শিক্ষার্থী হিসেবে আমার সঞ্চয় সীমিত। আধুনিক যুগে সাহিত্যের মাস্টারদের কাজ ছাড়াও বাংলাদেশের সাহিত্যিক মূল্যের সাথে সাথে আরও কী কী সামুদ্রিক সাহিত্য কাজ করে তা এখনও আরও অন্বেষণ করা দরকার। সমুদ্র অন্বেষণ করার ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে কীভাবে বাংলাদেশের মানুষ তথা জীবন বুঝতে পারে সে সম্পর্কে এখন আরও আলোচনা প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

Chinese

জি জিয়ানলিন, (১৯৫৭), *ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, হুবেই পিপলস পাবলিশিং হাউস

--- --- ---, (২০১০), জি জিয়ানলিনের সম্পূর্ণ কাজ, *অনুবাদ রামায়ণ*, বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা প্রেস

লু গ্যাং, (১৯৮৯), *ডিকশনারি অফ ওয়ার্ল্ড মিথস* [এম], লিয়াওনিং পিপলস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৭২৪

ডং ইউচেন, বাই কাইয়ুয়ান (সম্পাদিত), *কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ টেগোর*

লিউ জিয়ান, (২০১০), *ক্রনিকলস অফ দ্য কিংডম অফ বাংলাদেশ*, সোশ্যাল সায়েন্স লিটারেচার পাবলিশিং হাউস

লি জিনুন, (২০০৯), *ঠাকুরের চিন্তাধারা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ধর্মীয় উপাদানের উপর*, ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬

লিন চেংজি, (১৯৯৫), *ভারতের আধুনিক ইতিহাস*, পিকিং ইউনিভার্সিটি প্রেস

ঝো ঝিকুয়ান, (১৯৯২), *চীনের এনসাইক্লোপিডিয়া, বিদেশী সাহিত্য*, চায়না এনসাইক্লোপিডিয়া পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১৯০

English

Arif, Hakim (2012). "Poetry". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh* (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.

Azad, Humayun (2007). "Bangla Literature in the Nineteenth Century". In Islam, Sirajul (ed.). *History of Bangladesh 1704-1971*. 3: Social and Cultural History. Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh. p. 239.

Bandzopadhyay, Asit Kumar (2007) [1998]. *Bangla Sahityer Itibritta* [History of Bengali Literature] (in Bengali). VIII (3rd ed.). Kolkata: Modern Book Agency Pvt Ltd. pp. 502–520.

Chakraborty, Dr. Dulal (2007). *History of Bengali Literature* (in Bengali). Bani Bitan.

George, K. M., ed. (1993). *Modern Indian Literature: an Anthology: Fiction.* Vol. 2. New Delhi: Sahitya Akademi. pp. 93–94.

Khan, Sanjida (2012). "National Awards". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh* (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.

Langley, Winston (2007). *Kazi Nazrul Islam: The Voice of Poetry and the Struggle for Human Wholeness.* University of Minnesota. p. 5.

Leaturature of Farrukh Ahmad. farrukhfoundation.org. Archived from the original on 17 December 2012. Retrieved 17 January 2018.

Mitra, Priti K. (1 May 1993). "The Rebel Poet and the Mahatma: Kazi Nazrul Islam's Critique of Gandhi's Politics in the 1920s". South Asia Research. 13 (1): 46–55.

Muhammad Musa (1998). *Brahmanbariar Itibrittyo*. Shetu Prokashoni, Brahmanbaria.

Nirmal Kanti Bhattacharjee (2008). "Manik Bandopadhyay: A Centenary Tribute" in the Indian Literature.